Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মুহম্মদ আবদুল হাই : জীবন ও সাধনা

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.11
Pages	196-203
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মুহম্মদ আবদুল হাই : জীবন ও সাধনা

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯১৯ সালের ২৬শে নভেম্বর বুধবার পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মরিচা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল গনি, মায়ের নাম ময়মুন্নেসা খাতুন। মুর্শিদাবাদের পীর হজরত শাহ চাঁদের বংশধর জনাব আবদুল গণি রাজশাহীর কেরেশা গ্রামে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর জন্মস্থান মরিচা গ্রামের নিকটবর্তী বর্ধনপুর জুনিয়ার মাদ্রাসায় লেখাপড়া শুরু করেন। ১৯৩২ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে জুনিয়ার মাদ্রাসার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি রাজশাহী হাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং তাঁর বড় ভাই অবদুস আজিজের 'কাছে থাকতে শুরু করেন।' তিনি ১৯৩৬ মাসে উচ্চ মাদ্রাসা পরীক্ষায় (প্রবেশিকা) প্রথম বিভাগে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার (১৯৩৮) তিনি প্রথম বিভাগে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে ১৯২১ সালেই সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগে বাংলার একমাত্র লেকচারার ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯২৮ সালে সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে বিভাগে ফিরে আসেন। ১৯৩৭ সালের ১৬ই আগষ্ট সংস্কৃত থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্বে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এই নবসৃষ্ট বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রেরণায় ১৯৩৮ সালে বাংলা বিভাগে প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি হন মুহম্মদ আবদুল হাই। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৪১ সালে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় এবং ১৯৪২ সালে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনিই প্রথম মুসলিম ছাত্র যিনি বাংলা অনার্স ও এম. এ. উভয় পরীক্ষায় প্রথম

শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার গৌরব লাভ করেন।

'ছাত্র অবস্থাতেই ১৯৩৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর (১৩৪৩, ১৩ পৌষ, সোমবার) মরিচা গ্রামের বিত্তশালী জমিদার আলহাজ আতিউল্লাহ সরকারের পৌত্রী, আলহাজ আলিমুদ্দিন সরকারের কন্যা আনিসা বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের তিন পুত্র ও পাঁচ কন্যা।' (আজহারউদ্দিন খান, বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই, পৃ. ৬-৭)

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর কর্মজীবন শুরু হয় ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে। এখানে তিনি এক মাস শিক্ষকতা করেন। এরপর বাংলার লেকচারার পদে বেঙ্গল জুনিয়র এডুকেশন সার্ভিসে তিনি যোগ দেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজসমূহে অধ্যাপনা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৭ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তিনি 'অপশন' দিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে রাজশাহী সরকারী কলেজে লেকচারার পদে যোগদান করেন। এই কলেজে ১৯৪৮ সালে বাংলার অধ্যাপক পদে যোগ দেন ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। এখানেই ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে মুহম্মদ আবদুল হাই এর প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। এরপর আজীবন উভয়ে উভয়ের গুণগ্রাহী ও শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দেন ১৯৪৯ সালে। এ-সময় বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক গণেশচরণ বসু এবং ১৯৪৪ সালে অবসর গ্রহণের পর ১৯৪৮-৪৯ শিক্ষাবর্ষে সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক হিসেবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বিভাগে ফিরে আসেন। ১৯৫০ সালে বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত পুনরায় সংযুক্ত হয়ে বিভাগের নাম হয় বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ। অধ্যাপক গণেশচরণ বসু ১৯৫০-৫২ সালে এই বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৫২ সালের ১৫ই নভেম্বর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দুই বৎসরের জন্য বাংলা বিভাগের প্রফেসর এবং বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৫০ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের ভাষাতত্ত্বে অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য গমন করেন। লন্ডনে তিনি প্রফেসর জে. আর. ফার্থের নির্দেশনাধীনে *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে ১৯৫২ সালে ডিস্টিংশনসহ এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন এবং ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিভাগে ফিরে এসে লেকচারার পদে

যোগদান করে। ১৯৫২ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র প্রফেসর পদের দুই বৎসর মেয়াদের কার্যকাল পূর্ণ হলে তিনি দ্বিতীয়বার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময়, ১৯৫৪ সালে, মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের রীডার ও অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৯৬২ সালে বিভাগের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ৩রা জুন এক মর্মান্তিক ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই আকস্মিকভাবে এন্তেকাল করেন। তাঁর এই অকাল প্রয়াণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণার পরিবেশ উজ্জ্বল, সার্থকতামণ্ডিত ও গৌরবজনক করে তোলার জন্য বিশেষ কৃতিত্বের দাবীদার প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই। ১৯৫৪–৫৫ থেকে ১৯৬৮–৬৯ সালের মধ্যে গবেষণা-সংগঠক রূপে মুহম্মদ আবদুল হাই অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। এ সময়ের মধ্যে তাঁর নিজের ৩৭টি এবং বিভাগীয় অধ্যাপকদের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পিএইচ·ডি পর্যায়ে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই এদিকে সফল পথিকৃৎ। তাঁর তত্ত্বাবধানে এই বিভাগ থেকে প্রথম পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন মিসেস নীলিমা ইব্রাহিম (এপ্রিল, ১৯৫৯)। দু'মাস পর জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই-এর প্রয়াসের ফলে এ-বিভাগের ভূতপূর্ব ছাত্র ও অধ্যাপক এবং তৎকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রথম বিদেশী হিসেবে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করে।

প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই–এর এই তত্ত্বাবধানে বিভাগ থেকে ৪ জন গবেষক পিএইচ· ডি· ডিগ্রী লাভ করেন। এঁরা হচ্ছেন মিসেস নীলিমা ইব্রাহীম, জনাব আনিসুজ্জামান, জনাব গোলাম সাকলায়েন ও জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান। এ-ছাড়া শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ও জনাব আহমদ শরীফকে থিসিস উপস্থাপনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করেন। জনাব ওয়াকিল আহমদ প্রফেসর আবদুল হাই–এর তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করেন। উল্লেখযোগ্য যে, জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলামও প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই–এর তত্ত্বাবধানে কাজ শুরু করেন।

প্রফেসর আবদুল হাই–এর অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁর *সাহিত্য পত্রিকা* সম্পাদনা। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত দশ বছরের প্রতিটি সংখ্যা, বাংলা ভাষায় এ-ধরনের পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। *সাহিত্য পত্রিকা* র

পাশাপাশি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের কার্যক্রমও তিনি ঐ সময় গ্রহণ করেন। তিনি নিজে যেমন ধ্বনিবিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে একজন অগ্রণী ছিলেন তেমনি তাঁর অধ্যক্ষতার কালেই এই বিভাগের চারজন শিক্ষক জনাব মুনীর চৌধুরী, জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, জনাব কাজী দীন মুহম্মদ ও জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম— ধ্বনিবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বে যথাক্রমে হার্ভার্ড, লন্ডন, লন্ডন ও কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে আসেন। বাংলাদেশে বাংলাভাষা ও সাহিত্যে একদল গবেষক সৃষ্টি এবং তাঁদের গবেষণার সফল প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির যে অসাধারণ দৃষ্টান্ত প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই স্থাপন করে গেছেন তা আমাদের ভবিষ্যৎ কালের গবেষণার ক্ষেত্রে সর্বদা অনুপ্রেরণা সঞ্চার করবে।

প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-এর অধ্যক্ষতার কালে আয়োজিত বিভাগের অপর একটি সফল কার্যক্রমের উল্লেখ এখানে অত্যাবশ্যক মনে করি। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চেতনা বিকাশের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের এক অবিস্মরণীয় অবদান — 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০।' ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ২২ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালা ও প্রদর্শনী অসামান্য সাফল্য লাভ করে। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর ভাষণে বলেন :

> এককালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেশকালের সমস্যা-নিরপেক্ষ জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্র বলে বিবেচনা করা হতো। একালে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে তাই এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে নিছক জ্ঞানসাধনার গজদন্ত মিনার হিসেবে গণ্য করা হয় না জ্ঞান-সাধনা এখন দেশকাল নিরপেক্ষ নয়, অর্জিত জ্ঞান যাতে দেশের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্য নিয়োজিত হয়, একালের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সেভাবে চিন্তা করছে।
>
> এদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য বিভাগের মতো শিক্ষাদান এ বিভাগের প্রধান কর্তব্য হলেও দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য, আত্মিক বিশ্বাস এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা রক্ষণাবেক্ষণ, তার বিকাশ ও রূপায়ণে সহায়তা করাও বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকক্ষে দেশের ছেলেমেয়েরা যেভাবে বাংলাভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে, তার সঙ্গে আমাদের দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে পরিচিত করে তোলার জন্যে এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে বর্তমান ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপসংহারে তিনি শিক্ষার মাধ্যম ও ব্যবহারিক জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন :

> শুধু সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর দায়িত্ব না চাপিয়ে নিজেরা যেখানে দৈনন্দিন জীবনে বাংলার ব্যবহার করতে পারি— যেমন, নিজেদের মধ্যে কিংবা সভা-সমিতিতে

আলাপ-আলোচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় এবং হল ইউনিয়নগুলোর নিমন্ত্রণ-পত্রে, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে লেখা চিঠিপত্রে এবং ভাবের আদান-প্রদানে, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রে, দোকানপাটের নামপত্রে, গাড়ীর নম্বর-ফলকে সেখানে কেন যে বাংলা ব্যবহার করি না, আমি তাই ভেবে আশ্চর্য হই এখানে তো কেউ বাধা দেবার নেই তাছাড়া উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেবার পূর্বে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা আপনাপন বিষয়ে বাংলায় বোঝাতে পারেন, তাঁরা সাহস করে বাংলার বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলে ক্ষতি হয় না, বরঞ্চ তাতে তাঁদের বাংলা চর্চা করার সুযোগ হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে বাংলাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে পরিণত করার পথ প্রশস্ত হয় এদিক থেকে সজ্ঞানে, দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আমাদের বাংলা চর্চা করার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি [''ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৯৭০ পৃ ৩-৪]'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মুহম্মদ ওসমান গণি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন :

পঠন-পাঠনের নির্দিষ্ট কার্যক্রমের বাইরেও দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান অনুষ্ঠান তারই পরিচয় বহন করবে আমি আশা করি।

বাংলা ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন :

আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষার সর্বস্তরে ও সরকারী কাজকর্মে বাংলাভাষার প্রচলন হয়, এখন থেকেই তার যথাবিহিত ব্যবস্থার সূচনা করা হবে।

এই প্রত্যাশাকে সফল করে তুলতে হলে আমাদের সকলকেই কিছু সাধনা করতে হবে চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। সবদেশের সবকালের মানুষের জ্ঞান-সাধনার যা শ্রেষ্ঠ ফল, ভাষায় তার পরিচয় দেবার দায়িত্ব আমাদের। আধুনিক রাষ্ট্রের সর্ববিধ প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলাভাষাকে ক্রমেই বিস্তৃত পরিসরের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হবে

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর চারটি শাখা ছিল : ভাষার বিবর্তন, সাহিত্যের বিকাশ, লিপির পরিবর্তন ও মুদ্রণের ইতিহাস। তালিকা, পোস্টার, চিত্র, পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থের সাহায্যে এই প্রদর্শনী সজ্জিত হয়। সপ্তাহের সাফল্যের বিবরণের জন্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত— 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ, ১৩৭০' (বৈশাখ ১৩৭১) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বিবরণীর অংশ বিশেষ নিম্নরূপ :

'বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রদর্শনীর প্রতিটি অংশ বিষদভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। ফলে প্রদর্শনীটি বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের এবং সমকালীন পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্য সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে মাতৃভাষার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে সক্ষম হয়।

প্রদর্শনী প্রতিদিন দুপুর দু'টো থেকে সন্ধ্যা ছ'টা অবধি সর্বসাধারণের জন্যে

উন্মুক্ত থাকে। প্রদর্শনীতে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়; প্রতিদিন দীর্ঘ সারি দিয়ে শৃংখলার সঙ্গে হাজার হাজার মানুষ এই প্রদর্শনী দেখেন ও উপভোগ করেন। দর্শকদের মধ্যে অগণিত বিদেশী ও অবাঙালীও ছিলেন। অনুমান প্রতিদিন গড়ে দু'তিন হাজার এবং সাতদিনে অন্ততঃ বিশ হাজার লোক প্রদর্শনীটি দেখেন। প্রদর্শনীতে জনসাধারণের ভীড়ের চাপ এত অধিক হয়ে পড়েছিল যে প্রদর্শনী-প্রাঙ্গণটি অবিলম্বে স্থান-সংকুলানের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বিবেচিত হয়। প্রতিদিন বহু দর্শনেচ্ছু ব্যক্তিকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়। বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা যে নৈপুণ্য ও ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রদর্শনীর শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখেন— তা প্রশংসার যোগ্য।" [ঐ, পৃ. ৮]

"বাংলাভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উপলক্ষে প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেপ্টেম্বরের ২২, ২৪, ২৬ ও ২৮ তারিখ সন্ধ্যায় বসে বাংলা কবিতা, গদ্য ও নাটকপাঠ এবং বাংলা গানের আসর। এই আসরগুলির লক্ষ্য ছিল বাংলা সাহিত্য ও গীতিরচনার ধারার সঙ্গে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অধ্যাপক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এই আসরগুলিতে বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। কোন কোন অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রীরাও যোগ দেন। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানই সকলে অত্যন্ত উপভোগ করেন।

২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ সন্ধ্যা সাতটায় প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান মূল প্রবন্ধগুলি পড়েন। এই সভার উদ্দেশ্যে ছিল আমাদের সাহিত্যধারা সম্পর্কে সকলকে একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া। মূল প্রবন্ধলেখক ছাড়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম, জনাব সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (প্রাচীন সাহিত্য); অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ও অধ্যাপক আহমদ শরীফ (মধ্যযুগের সাহিত্য); অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ও জনাব আবদুল কাদির (আধুনিক সাহিত্য)।

অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই আলোচনা-সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করেন। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই অসাধারণ জনসমাবেশ হয়।" [ঐ, পৃ. ১৩-১৪]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের প্রস্তুতি সমিতির সভাপতি

ছিলেন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই; আহ্বায়ক ছিলেন তৎকালীন বিভাগীয় ছাত্র আশিক ওয়াহেদ মোহাম্মদ আসাদুল ইসলাম চৌধুরী (আসাদ চৌধুরী) ও মুহম্মদ মুজাদ্দেদ এবং ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম ও ডক্টর আনিসুজ্জামান।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের অসামান্য সাফল্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠন ও গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সংযোজন করে। তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় এ সম্পর্কে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্যে তার স্বাক্ষর আছে। [ঐ, পৃ. ৬৭-৯৩]

প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-এর রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তালিকা থেকে তাঁর মেধা, শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় :

১॥ *সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (প্রবন্ধ গ্রন্থ), বি. এফ. এইচ. পাবলিশিং হাউস, ঢাকা১৯৫৪।২।। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [আধুনিক যুগ], সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫। ৩।। বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৫৮। ৪।। *A Phonetic and Phonological Study of Nasals and Nasalization in Bengali.* University of Dacca. May 1960. ৫।। *ভাষা ও সাহিত্য* (প্রবন্ধ গ্রন্থ), ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা মার্চ ১৯৬০।৬।। *তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা* (প্রবন্ধ গ্রন্থ), গ্রেট বেঙ্গল লাইব্রেরী, ঢাকা ডিসেম্বর ১৯৬০। ৭।। *হারামণি* (৫ম খণ্ড (মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন সংকলিত), সম্পাদনা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬১। ৮।। *The Sound Structure of English and Bengali.* [with W. J. Ball. Department of Bengali, University of Dacca. August 1961. ৯।। *মধ্যযুগেরবাংলা গীতি-কবিতা* (আহমদ শরীফ সহযোগে), সম্পাদনা, ঢাকা ১৯৬১। ১০।। *Traditional Culture in East Pakistan* (with Dr. Muhammad Shahidullah). Department of Bengali. University of Dacca. December 1963. ১১।। *ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ*, ১৩৭০ (সম্পাদনা), বৈশাখ ১৩৭১।১২।। *গল্প-বিচিত্রা* (সম্পাদনা), ঢাকা ১৩৭০। ১৩। *ধ্বনিবিজ্ঞানও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, নভেম্বর ১৯৬৪। ১৪।। *প্রাকৃত প্রবেশিকা* (এ. সি. ওলনর ও পি. আর. বড়ুয়া সহযোগে) (অনুবাদ) ১৫।। *কালকেতু উপাখ্যান* (আনোয়ার পাশা সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা ১৯৬৭। ১৬।। *মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান* (আনোয়ার পাশা সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা ১৯৬৭। ১৭।। *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য* (আনোয়ার পাশা সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা ১৯৬৭। ১৮।।

গীতিকা (আনোয়ার পাশা সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা ১৯৬৮। ১৯
দ্বিজেন্দ্রলাল : সাজাহান (মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা
.৬৮।২০।। *দীনবন্ধু-রচনাসংগ্রহ* (আনিসুজ্জামান সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা
.৬৮।২১।।*বিদ্যাসাগর-রচনাসংগ্রহ* (আনিসুজ্জামান সহযোগে) সম্পাদনা, ঢাকা
.৯৬৮।২২।। *ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ* (আনোয়ার পাশা সহযোগে) সম্পাদনা,
ঢাকা ১৩৭৬।

এছাড়া ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় তাঁর অনেক প্রবন্ধ দেশী বিদেশী সংকলন গ্রন্থে ও পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক এ-সব প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তাঁর সাধনার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। স্বল্পায়ু জীবনে মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলাদেশের ভাষা, বিশেষত ধ্বনিতত্ত্ব চর্চায় ও সাহিত্য গবেষণায় যে অবদান রেখে গেছেন এবং যে নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তা কালের পরিপ্রেক্ষিতে অসাধারণ ও অসামান্য।